بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৫ই এপ্রিল, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, কুরআন পবিত্র কুরআনে নামায পড়ার প্রতি বেশ কয়েক স্থানে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। কোথাও নামাযের হিফাযত বা সুরক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কোথাও নিয়মিত নামায পড়ার নির্দেশ রয়েছে আবার কোন স্থানে সময়মত নামায পড়ার নির্দেশ রয়েছে, আর এর জন্য নির্দিষ্ট সময়েরও উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, এই হলো নামাযের সময় যা একজন মু'মিনকে মেনে চলার বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। এক কথায় নামায কায়েম এবং নামাযের আবশ্যকতা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বারবার একজন মু'মিনকে নসীহত করেছেন। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা যা বলেছেন তাহলো মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই হলো ইবাদত।

যেমন তিনি বলেন, "**وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ**" (সূরা আয্-যারিয়াত: ৫৭) অর্থাৎ জ্বিন এবং মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই হলো ইবাদত করা। কিন্তু মানুষ এই উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করে না এবং এটি থেকে দূরে পড়ে আছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

"আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য যা নির্ধারণ করেছেন তাহলো তোমরা খোদার ইবাদত কর। কিন্তু যারা এই মৌলিক ও প্রকৃতিগত উদ্দেশ্যকে বিসর্জন দিয়ে পশুর মত কেবল পানাহার এবং নিদ্রাকে জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে তারা খোদার কৃপা থেকে বঞ্চিত হয় এবং খোদার ওপর তাদের আর কোন দায়-দায়িত্ব থাকে না।" অতএব বিশ্বাস বা ঈমানের দাবীদার একব্যক্তিকে পুরো চেষ্টা এবং গভীর মনোযোগ দিয়ে এই লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হওয়া উচিত যেন সে খোদার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হতে পারে, খোদার কৃপাবারি লাভ করতে পারে। আর ইবাদতের এই উদ্দেশ্য কীভাবে সাধিত হতে পারে? এর জন্য ইসলাম আমাদেরকে পাঁচবেলা নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছে। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, **"ইবাদতের প্রাণ হলো নামায"**। অতএব এই লক্ষ্য অর্জন করার মাধ্যমেই আমরা ইবাদতের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারি। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা এ যুগের ইমামকে গ্রহণ করেছি বা মেনেছি, যিনি আমাদেরকে ইবাদতের সঠিক রীতি-পদ্ধতি শিখিয়েছেন, ইবাদতের সত্যিকার প্রজ্ঞা এবং উদ্দেশ্য শিখিয়েছেন, আমাদেরকে এটিও শিখিয়েছেন যে, ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য কি। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে তিনি বারংবার নামাযের প্রতি নিজ জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন, এর খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করেছেন, এর উদ্দেশ্য, প্রজ্ঞা এবং প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট করেছেন, যেন আমরা নামাযের গুরুত্ব অনুধাবন করে সুন্দরভাবে ও সুচারুরূপে নামায পড়তে পারি। এখন আমি এই প্রেক্ষাপটে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কয়েকটি উদ্বৃতি উপস্থাপন করব। অনেক সময় চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ার কারণে বা রাত অতি সংক্ষিপ্ত বা স্বল্প দৈর্ঘ হওয়ার কারণে ফজরের নামাযের বেলায় আলস্য হয়ে যায়। সচরাচর যোহর আসরের নামায মানুষ হয়তো জমা করে বা

অনেককে আমি দেখেছি যারা কাজের চাপের কারণে নামাযই পড়ে না। অতএব চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া হোক বা রাতের ঘুম পূর্ণ না হোক বা কাজের ব্যস্ততাই হোক না কেন এসব কারণে মানুষ হয়তো নামায ছেড়ে দেয় বা অনেকেই এমনও আছে যারা বলে, আমরা তিন বেলার নামায জমা করি বা করেছি। আজকাল এসব দেশে খুব দ্রুত নামাযের সময় এগিয়ে আসছে। পূর্বের চেয়ে এখন ফজরের নামাযে এক বা দেড় সারি কমে গেছে বা কমতে আরম্ভ করেছে। কিছু মানুষ যারা বাহির থেকে এসেছে বা আসে তাদের কারণে হয়তো কখনও কখনও সংখ্যা বেড়ে যায় কিন্তু স্থানীয়দের এ বিষয়ে মনোযোগ দেয়া উচিত, অর্থাৎ যারা মসজিদের আশেপাশে বসবাস করেন বা যাদের হালকা এটি (তাদের)। আপনারা রীতিমত আপনাদের মসজিদে বা নামায সেন্টারে নামাযের জন্য যাবেন, বিশেষ করে ফজরের নামায পড়ার জন্য। শুধু এখানেই নয় বরং বিশ্বের সব দেশেই মসজিদ আবাদ করার চেষ্টা থাকা চাই। বিশেষ করে ওহদাদার এবং জামাতের কর্মকর্তা-কর্মচারী আর ওয়াকফে যিন্দেগীগণ যদি এর প্রতি মনোযোগী হয় তাহলে নামাযে উপস্থিতি অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে। রীতিমত এবং যথাযথভাবে নামায পড়া এবং নামায কায়েম করা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক বৈঠকে বলেন,

“নামায রীতিমত আবশ্যকীয় দায়িত্ব হিসেবে কায়েম কর। অনেকেই শুধু এক বেলার নামায পড়ে। স্মরণ রাখা উচিত, নামায থেকে ছুটি পাওয়া যায় না বা নামায মাফ হয় না, এমনকি নবীদের নামাযও মাফ করা হয়নি। এক হাদীসে এসেছে, একটি নতুন জামাত মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে এবলে নিজেদের নামায মাফ করাতে চেয়েছিল যে, আমাদের ব্যস্ততা আছে, কাজের চাপ অনেক বেশি তাই আমাদের নামায মাফ করা হোক। তিনি (সা.) বলেন, যে ধর্ম আমল বা কর্ম-শূন্য সেটি কোন ধর্মই নয়। তাই এ কথা ভালোভাবে স্মরণ রাখ এবং নিজেদের আমল বা কর্মকে আল্লাহ্ তা’লার শিক্ষা বা নির্দেশের অধিনস্ত কর। আল্লাহ্ তা’লা বলেন, আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর মাঝে এটিও একটি নিদর্শন যে, আকাশ এবং পৃথিবী তাঁর নির্দেশেই নিজ নিজ জায়গায় বিদ্যমান । প্রকৃতিবাদী স্বভাবের মানুষরা অনেক সময় বলে, প্রকৃতি পূজারী ধর্মই অনুসরণের যোগ্য কেননা; স্বাস্থ্যসংক্রান্ত নীতিসমূহ যদি অনুসরণ না করা হয় তাহলে তাক্বওয়া এবং পবিত্রতা অর্জনে কী লাভ? বস্তুবাদী মানুষ বলে, থাকে যে, জাগতিক এবং প্রাকৃতিক অনেক নিয়ম-নীতি রয়েছে, সেগুলো অনুসরণ করা উচিত। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি আছে যে, এই এই জিনিসগুলো মেনে চলতে হবে, এগুলো যদি মেনে না চল , যদি স্বাস্থ্য বজায় না থাকে, তাক্বওয়া এবং পবিত্রতাও বজায় থাকতে পারে না। সুতরাং এমন তাক্বওয়া এবং পবিত্রতা থেকে লাভ কী? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা’লার নিদর্শনাবলীর একটি হলো, অনেক সময় ঔষধ অকার্যকর হয়ে যায় আর স্বাস্থ্য রক্ষা-সংক্রান্ত নীতিগুলোও কোন কাজে আসে না। ঔষধও কাজে আসে না আর দক্ষ চিকিৎসকও কাজে আসে না, কিন্তু যদি খোদার নির্দেশ আসে তাহলে অগোছালো বিষয়ও সুবিন্যস্ত হয়ে যায়।”**

অতএব আসল বিষয় হলো খোদার কৃপা। মানুষের এই ধারণা ভুল যে, স্বাস্থ্যই সব কিছু বা অমুক অমুক কাজ করলে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, অসুস্থতার সময় অমুক ঔষধ খেলেই স্বাস্থ্য ভালো

হয়ে যাবে। এসব কিছু খোদার নির্দেশের অধীনে কাজ করে আর আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যদি না থাকে তাহলে সবকিছু বৃথা। অতএব যার ইচ্ছা এবং নির্দেশে সবকিছু চলছে তাঁর সামনে আমাদের বিনত হতে হবে এবং তাঁরই ইবাদত করতে হবে, তাঁর সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। কাজেই নামায যেখানে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আবশ্যক সেখানে তা বিপদাপদ এবং সমস্যা থেকেও আমাদের সুরক্ষা করে। আমাদের অনেক কাজ এমন আছে যা বাহ্যতঃ অসম্ভব মনে হয়, কিন্তু খোদার দরবারে সমর্পিত হলে এবং খোদার সাথে সম্পর্কের কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠে। অতএব যা কিছু সাধিত হয় খোদার ইচ্ছা অনুসারেই হয়। সে কারণেই খোদার কৃপাধন্য হওয়ার বেশি বেশি চেষ্টা করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, **"আসল কথা হলো আল্লাহ্ তা'লা যা চান তাই করেন। তিনি বিরান ভূমিকে আবাদ করেন আবার আবাদ ভূমিকে বিরান ভূমিতে পরিণত করেন। দেখ! বাবেল শহরের সাথে তিনি কি ব্যবহার করেছেন। মানুষ যেই জায়গা আবাদ করার পরিকল্পনা করেছিল আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তা বিরান ভূমিতে পরিণত হয়েছে এবং পেঁচার বসতিস্থলে হয়ে যায় আর যেই জায়গা সম্পর্কে মানুষ চাইত যে, তা বিরান ভূমিতে পরিণত হোক তা পৃথিবীর সমগ্র মানব মন্ডলীর প্রত্যাবর্তন স্থল বা বার বার ফিরে আসার জায়গায় পরিণত হয়েছে অর্থাৎ মক্কা নগরী। তাই স্মরণ রেখ! আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে ঔষধ এবং পরিকল্পনার ওপর নির্ভর করা চরম নির্বুদ্ধিতা। নিজেদের জীবনে এমন পরিবর্তন আনয়ন কর যেন তা এক নতুন জীবন রূপে প্রতিভাত হয়। অজস্র ধারায় ইস্তেগফার কর। যাদের জাগতিক কাজ- কর্মের আধিক্যের কারণে সময় কম থাকে তাদের সবচেয়ে বেশি ভয় করা উচিত। যারা মনে করে, আমাদের জাগতিক ব্যস্ততা অনেক, জাগতিক কাজ-কর্ম আমাদের অনেক বেশি, ইবাদত এবং নামায পড়ার সুযোগ আমাদের নেই, তাদের সবচেয়ে বেশি ভয় করা উচিত। চাকরিজীবিদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্-কর্তৃক নির্ধারিত আবশ্যকীয় দায়িত্ব অধিকাংশ সময় বাদ পড়ে যায়। তাই বাধ্য-বাধকতার ক্ষেত্রে যোহর-আসর এবং মাগরিব-ইশার নামায জমা করে পড়া বৈধ। আমি এটিও জানি শাসকের কাছে বা কর্মকর্তার কাছে যদি নামাযের অনুমতি চাওয়া হয় তাহলে তারা অনুমতি দেয়।** মানুষ যেখানে চাকরি করে সেখানে কর্মকর্তাদের ওপর যদি তাদের ভালো প্রভাব থাকে তাহলে নামাযের অনুমতি চাইলে তারা নামাযের অনুমতি দিয়ে দেয়। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে নিম্নপদস্থ কর্মকর্তাদের এজন্য বিশেষ দিক-নির্দেশনাও থেকে/দেয়া থাকে। অনেক সময় এমন নির্দেশ সত্যিই দেয়া হয়ে থাকে।তিনি (আ.) বলেন, **"নামায পরিত্যাগের প্রেক্ষাপটে এমন অযথা টালবাহানা আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আল্লাহ্ এবং বান্দার অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে অন্যায় এবং সীমালঙ্ঘন করো না। পরম সততার সাথে নিজেদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন কর।"**

শুধু নামাযই নয় বরং তিনি আমাদের কাছে এর চেয়েও বড় প্রত্যাশা রাখেন। নামায এবং তাহাজ্জুদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"এই পুরো জীবনকাল যদি জাগতিক কাজকর্মেই কেটে যায় তাহলে পরকালের জন্য কি সঞ্চয় করলে? যদি জীবনের পুরো সময়, প্রতিটি নিঃশ্বাস, প্রতিটি মুহূর্ত মানুষ জাগতিক আয়-

উপার্জনেই ব্যয় করে তাহলে পরকালের জন্য সে কি সঞ্চয় করলো? তিনি (আ.) বলেন, **বিশেষ সচেতনতার সাথে তাহাজ্জুদের জন্যও উঠো আর সুগভীর একাগ্রতা ও আগ্রহের সাথে তা পড়। মধ্যবর্তী নামাযগুলোতে চাকরির কারণে পরীক্ষা এসে যায়। আল্লাহ্ তা'লাই প্রকৃত জীবিকা বিধায়ক।”** তাই নামায যথাসময় পড়া উচিত। কোন কোন সময় যোহর-আসরের নামায জমা হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা জানেন, মানুষ দুর্বলই হবে, তাই তিনি এই ছাড় দিয়েছেন। কিন্তু এই ছাড় তিন বেলার নামায জমা করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেখানে চাকরী এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে মানুষ শাস্তি পায় আর সরকার বা কর্মকর্তাদের ক্রোধভাজন হয় সেখানে খোদার খাতিরে কোন কষ্ট সহ্য করা কতইনা প্রশংসনীয় বিষয়। জাগতিক চাকরীতে কাজকর্মের ক্ষেত্রেও মানুষ শাস্তি পেয়ে থাকে, আবার অনেক সময় কষ্টও সহ্য করে। তাই নামায পড়ার জন্য বা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য যদি কিছুটা কষ্ট করতে হয় তাহলে এটি তো আগাগোড়াই কল্যাণ । অতএব একজন মু'মিনের সর্বদা এটি স্মরণ রাখা উচিত। এখন রাত ছোট হয়ে আসছে। তাই এই ছোট রাত নামায কাযা করার কারণ যেন না হয় বা সম্পূর্ণভাবে নামায ছেড়ে দেয়ার কারণ যেন না হয় আর জাগতিক কর্ম ব্যস্ততাও যেন নামাযের পথে বাধ সাধতে না পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের সব সময় আত্মজিজ্ঞাসায় রত থাকা উচিত। আমাদের অনেকে আবশ্যকীয় দায়িত্ব হিসেবে নামায পড়ে থাকে ঠিকই, কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ এবং মর্ম তারা বুঝে না। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, **“নামায কী? এটি একটি বিশেষ দোয়া। কিন্তু মানুষ নামাযকে বাদশাহ্দের কর মনে করে, যেন বাধ্য হয়ে পরিশাধ করছে, যেন তাদের ওপর কর চাপানো হয়েছে। নির্বোধ এতটাও জানে না যে, আল্লাহ্ তা'লার এসব কিছুর প্রয়োজন কী? তাঁর ব্যক্তিগত আত্মাভিমান এর মুখাপেক্ষী নয় যে, মানুষ দোয়া করবে এবং আল্লাহ্ তা'লার পবিত্রতা ও আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের ঘোষণা করবে। এতে মানুষের জন্যই কল্যাণ নিহিত** অর্থাৎ সে এভাবে তার লক্ষ্যে এবং গন্তব্যে পৌঁছে যায়। তিনি (আ.) বলেন, **“এটি দেখে আমার খুবই আক্ষেপ হয় যে, আজকাল ইবাদত, তাক্বওয়া এবং ধর্মকর্মের প্রতি ভালোবাসা নেই। কু-প্রথার একটি সার্বজনীন বিষক্রিয়াই হলো এর মূল কারণ। এ কারণেই খোদার ভালোবাসা উবে যাচ্ছে আর ইবাদতে যে ধরণের স্বাদ পাওয়া উচিত মানুষ সেই স্বাদ পায় না।** এই পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই যাতে আল্লাহ্ তা'লা স্বাদ এবং এক প্রকার বিশেষ আনন্দ রাখেন নি। যেভাবে একজন রোগী পরম উৎকৃষ্ট সুস্বাদু খাদ্যেরও স্বাদ পায় না এবং সেটিকে তিক্ত ও বিস্বাদ মনে করে, অনেক সময় অসুস্থতার কারণে মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়, অনুরূপভাবে যারা আল্লাহ্‌র ইবাদতে আনন্দ বা স্বাদ পায় না তাদের নিজেদের রোগ সম্পর্কে চিন্তিত হওয়া উচিত। যেমনটি আমি এখনই বলেছি যে, এ পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই যাতে আল্লাহ্ তা'লা কোন না কোন স্বাদ অন্তর্নিহিত রাখেন নি। আল্লাহ্ তা'লা মানব জাতিকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, তাই কী কারণ থাকতে পারে যে, এই ইবাদতে তার জন্য কোন আনন্দ এবং স্বাদ অন্তর্নিহিত থাকবে না? একদিকে তিনি বলছেন, আমি সৃষ্টিই করেছি ইবাদতের জন্য অথচ ইবাদতে কোন স্বাদ বা আনন্দ রাখবেন না? তিনি (আ.) বলেন, **“আনন্দ এবং স্বাদ অবশ্যই অন্তর্নিহিত আছে কিন্তু সেটিকে উপভোগ করার মানুষও তো**

চাই, সেই স্বাদ অর্জনের চেষ্টা করাও প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, “وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ” (সূরা আয্-যারিয়াত: ৫৭) **এখন মানুষ যেখানে সৃষ্টিই হয়েছে ইবাদতের জন্য তাই ইবাদতে পরম মার্গের স্বাদ এবং আনন্দও অন্তর্নিহিত রাখা আবশ্যক। আমরা দৈনন্দিন জীবনের পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার আলোকে একথা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারি।** সব কাজেই আল্লাহ্ তা'লা আনন্দ এবং সুখ অন্তর্নিহিত রেখেছেন তা দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে বোঝা যায় বা অভিজ্ঞতা হয়। তিনি (আ.) বলেন, **“দেখ! খাদ্য শস্য ও সকল খাদ্য-পানীয় যা মানুষের জন্য সৃষ্টি হয়েছে এগুলো কি সে উপভোগ করে না, সে কি এর স্বাদ পায় না? বরং সুস্বাদু খাবার যদি রান্না করা হয় তাহলে মানুষ পরম আনন্দ পায়। এই আনন্দ এবং স্বাদকে উপভোগ করার জন্য তার মুখে কি জিহ্বা নেই? সুন্দর জিনিস দেখে, উদ্ভিদ হোক বা জড় বস্তু হোক, মানুষ হোক বা পশু, সে কি আনন্দ পায় না? অতএব সে খাবারের স্বাদও পায় আর সৌন্দর্যের স্বাদও চোখের মাধ্যমে উপভোগ করে। মনভোলা এবং সুললিত কন্ঠ কি তার কান উপভোগ করে না?** আল্লাহ্ তা'লা কান সৃষ্টি করেছেন, সুন্দর সুর বা সুন্দর আওয়াজ কানে পড়লে হৃদয় আনন্দিত হয়। **অতএব এই বিষয়টি বোঝার জন্য কি আরও প্রমাণ প্রয়োজন যে, ইবাদতে স্বাদ অন্তর্নিহিত আছে।** এসব জিনিস যা আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টি করেছেন যাতে মানুষ স্বাদ এবং আনন্দ পায় কিন্তু ইবাদতে স্বাদ থাকবে না এটি কীভাবে সম্ভব। এ সবকিছু এ কথার প্রমাণ যে, ইবাদতেও আল্লাহ্ তা'লা আনন্দ এবং স্বাদ অন্তর্নিহিত রেখেছেন। তিনি (আ.) বলেন, **আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি নর ও নারীকে জোড়া বা জুটি করে সৃষ্টি করেছি এবং পুরুষের মাঝে এর প্রতি আকর্ষণ রেখেছি। এখন এতে কেবল বাধ্য বাধকতাই নয় বরং আনন্দও রেখেছেন। যদি শুধু বংশ বিস্তারই মূল উদ্দেশ্য হতো তাহলে লক্ষ্য অর্জিত হতো না। আল্লাহ্ তা'লার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো মানব সৃষ্টি। আর এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নর ও নারীর মাঝে তিনি একটি সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন আর প্রসঙ্গত তাতে এক ধরনের স্বাদ ও আনন্দ অন্তর্নিহিত রেখেছেন। কিন্তু অধিকাংশ নির্বোধের দৃষ্টিতে এটিই মূল উদ্দেশ্য।** কিছু দুনিয়ার কীট এবং নির্বোধ মনে করে, আমাদের মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য এটিই। তিনি (আ.) বলেন, **একইভাবে এই বিষয়টিও ভালোভাবে বুঝে নাও যে, ইবাদত কোন বোঝা বা কর নয়, এতেও একটি স্বাদ এবং আনন্দ অন্তর্নিহিত আছে। এই স্বাদ এবং আনন্দ জাগতিক সব স্বাদ ও আনন্দ এবং রিপুর সকল ভোগ বিলাস থেকে উন্নত ও মহান।** তিনি (আ.) বলেন, **যেভাবে একজন রোগী পরম উৎকৃষ্ট খাবারের স্বাদ থেকেও বঞ্চিত থাকে অনুরূপভাবে, হ্যাঁ অবিকল সেভাবেই চরম দুর্ভাগা মানুষই আল্লাহ্‌র ইবাদতকে উপভোগ করে না।** যদি একজন রোগী রোগের কারণে এবং মুখ তিতা হওয়ার কারণে একটি উত্তম খাবার পছন্দ না করে, এর স্বাদ যদি না পায় তার অর্থ এটি নয় যে, সেই খাবার নষ্ট বরং এর অর্থ হলো, সে অসুস্থ। অনুরূপভাবে যে নামায এবং ইবাদত উপভোগ করে না তার অর্থ এমনটি নয় যে, নামাযে কোন আনন্দ বা স্বাদ নেই বা আল্লাহ্ তা'লা রাখেন নি। আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই তা অন্তর্নিহিত রেখেছেন কিন্তু মানুষের নিজের স্বভাব, প্রকৃতি, অসুস্থতা এবং রুচি বিকৃতির কারণে সে তার স্বাদ পায় না।

অতএব আমাদের উচিত নামায উপভোগ করার চেষ্টা করা। এটিকে মাথার বোঝা হিসেবে ছুড়ে ফেলার জন্য পড়া উচিত নয়। এমন পরিস্থিতি যদি হয় তাহলে আমি যেমনটি বলেছি, অনেকেই রাত দীর্ঘ হলে ফজরের নামাযে আসে কিন্তু রাত ছোট হলে ফজরের নামাযে আসা ছেড়ে দেয়। আশা করি, তারা স্বাদ পাওয়ার উদ্দেশ্যে এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করবে এবং অন্যান্য বেলার নামায পড়ার বিষয়েও তারা মনোযোগী হবে।

এরপর নামাযের আনন্দ এবং নামাযের স্বাদ পাওয়া সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অন্যত্র বলেন, **"বস্তুতঃ আমি দেখি, নামাযে মানুষের উদাসীন্য এবং অলস্যের কারণ হলো, তারা সেই আনন্দ এবং স্বাদ সম্পর্কে অনবহিত যা আল্লাহ্ তা'লা নামাযে অন্তর্নিহিত রেখেছেন। এছাড়া শহর এবং গ্রামে আরও বেশি আলস্য এবং ঔদাসীন্য প্রদর্শিত হয়। শতভাগ তো দূরের কথা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মানুষও সত্যিকার ভালোবাসার সাথে নিজ প্রভুর দরবারে বিনত হয় না বা মাথা নত করে না। প্রশ্ন দাঁড়ায়, কেন তারা এই আনন্দ এবং স্বাদ সম্পর্কে অবহিত নয় আর কেন তারা কখনও এই স্বাদ পায়নি? ধর্মে এমন ফাঁকা কোন নির্দেশ নেই। অনেক সময় এমন হয় যে, আমরা আমাদের কাজে মগ্ন থাকি, মুয়ায্যিন আযান দেয় অথচ মানুষ তা শোনাও পছন্দ করে না। অর্থাৎ আযানের ধ্বনি কানে পড়লে তারা তা শুনতেও চায় না বা মনোযোগই দেয় না, এভেবে যে এখন তো নামাযে যেতে হবে । এদের অবস্থা বড় করুন। এখানেও অনেকেই এমন আছে, তাদের দোকান মসজিদেরই নীচে কিন্তু কোন সময় গিয়ে নামাযে দাঁড়ায়ও না। অতএব আমি বলতে চাই, হৃদয়ে সুগভীর অন্তর্জালা নিয়ে এবং পরম আবেগ দিয়ে দোয়া করা উচিত, যেভাবে ফলফলাদি এবং হরেক প্রকার জিনিসে বিভিন্ন প্রকার স্বাদ দিয়েছ, তদ্রুপ নামায এবং ইবাদতেরও একটিবার স্বাদ পাইয়ে দাও।** তিনি (আ.) বলেন, **মানুষ মুখে খাবার এবং ফলফলাদির স্বাদ ঠিক সেভাবে তোমরা এ এই দোয়া কর যে, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে নামাযেরও স্বাদ পাইয়ে দাও। সুস্বাদু কিছু খেলে মনে থাকে। দেখ! কেউ যদি গভীর আগ্রহ ও আনন্দ নিয়ে কোন সুদর্শনকে দেখে তাহলে তার তা ভালোভাবে স্মরণ থাকে। এছাড়া কুৎসিত চেহারা ও ঘৃণ্য অবয়বের কাউকে দেখলে তার পুরো অবস্থা এর গঠনের নিরিখে তার সামনে বীমূর্ত হয়। অতএব সুন্দর-অসুন্দর উভয়ের কথা মনে থাকে। তবে, যদি কোন সম্পর্ক না থাকে বা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে কিছুই মনে থাকে না। অনুরূপভাবে বেনামাযীদের দৃষ্টিতে নামায হলো, এক প্রকার জরিমানা, অর্থাৎ অনর্থক সকালে উঠে প্রচন্ড শীতের মধ্যে ওযু করে আরামদায়ক সুখনিদ্রা বিসর্জন দিয়ে বেশ কয়েক প্রকার সুখ ও আনন্দ জলাঞ্জলি দিয়ে পড়তে হয়। আসল কথা হলো, নামাযের প্রতি তার এক প্রকার অনীহা রয়েছে যা সে বুঝে উঠতে পারে না। সেই স্বাদ এবং প্রশান্তি যা নামাযে অন্তর্নিহিত আছে সে সম্পর্কেও সে অবহিত নয়, তাই নামাযে সে কীভাবে স্বাদ পেতে পারে? তিনি (আ.) বলেন, আমি দেখি, একজন মদ্যপ এবং নেশাখোর যতক্ষণ আনন্দ না পায়, যতক্ষণ না তার নেশা হয় উপর্যুপরি পান করতে থাকে । বুদ্ধিমান এবং পুণ্যবান মানুষ এ দৃষ্টান্ত থেকেও শিখতে পারে।** নেশাবাজের এই যে দৃষ্টান্ত তা থেকেও একজন বুদ্ধিমান মানুষ শিখতে পারে বা লাভবান হতে পারে, **তা কী? তাহলো নিয়মিত নামায পড়া এবং অবিরত পড়তে থাকা**

এবং স্বাদ পাওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখা। যতক্ষণ তার কাছে নামায উপভোগ্য না হয়ে উঠে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়াও করা উচিত এবং রীতিমত নামায পড়তে থাকা উচিত । যেভাবে মদ্যপ ব্যক্তির মন-মস্তিকে একটি স্বাদ বা নেশা বিরাজ করে যা হস্তগত করা তার লক্ষ্য হয়ে থাকে অনুরূপভাবে অন্তর এবং সমস্ত শক্তি-বৃত্তির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নামাযে সেই আনন্দ বা স্বাদ পাওয়া। এরপর সেই স্বাদ ও আনন্দ লাভের জন্য নিষ্ঠা এবং আবেগের সাথে হৃদয় থেকে দোয়া উদ্ভূত হওয়া উচিত যা নিদেনপক্ষে সেই নেশাখোরের ব্যাকুলতা এবং উৎকন্ঠার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতএব এক প্রকার ব্যাকুলতা ও উৎকন্ঠা সৃষ্টি হওয়া দরকার যা দোয়ায় পর্যবসিত হবে। তিনি (আ.) বলেন, আমি বলবো আর প্রকৃত অর্থেই বলছি, নামাযে সেই স্বাদ এবং আনন্দ অবশ্যই লাভ হবে।

এরপর নামায পড়ার সময় সেসব লক্ষ্যও যেন অর্জন যা নামাযের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আর ইহ্‌সান (নামায সুন্দরভাবে পড়া) যেন লক্ষ্য হয়। তিনি (আ.) বলেন, “إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ” (সূরা হূদ: ১১৫) **অর্থাৎ পুণ্য পাপকে দূরীভূত করে। অতএব এসব পুণ্য এবং স্বাদ ও আনন্দকে হৃদয়ে জাগ্রত রেখে দোয়া করা উচিত অর্থাৎ সেই নামায যেন ভাগ্যে জোটে যা সত্যবাদী এবং সৎকর্মশীলদের নামায। এই যে বলা হয়েছে, “إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ” অর্থাৎ পুণ্য বা নামায পাপ মোচন করে, অন্যত্র যা বলা হয়েছে, নামায অশ্লীলতা এবং অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত রাখে অথচ আমরা দেখি, অনেকে নামায পড়া সত্ত্বেও আবার পাপ করে।** পৃথিবীতে এমনটিই দেখা যায় যে, অনেকেই আছে যারা বাহ্যতঃ নামায পড়ে আবার পাপেও লিপ্ত থাকে। এর উত্তর হলো, এরা নামায পড়লেও সেই প্রেরণা এবং তাক্বওয়ার সাথে পড়ে না, সত্যের সাথে এবং গভীর মনোযোগ দিয়ে নামায পড়ে না। তারা প্রথাগতভাবে ও অভ্যাসবশে সিজদা করে মাত্র। তাদের আত্মা মৃত। আল্লাহ্ তা'লা এই নামাযের নাম হাসানাত বা পুণ্য রাখেন নি। এখানে অর্থ একই হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা 'সালাত' শব্দের পরিবর্তে 'হাসানাত' শব্দ ব্যবহার করেছেন যার উদ্দেশ্য হলো, নামাযের বৈশিষ্ট্য আর নামাযের সৌন্দর্যের প্রতি ইঙ্গিত করা। অর্থাৎ সেই নামায পাপ বিমোচন করে যা নিজের মাঝে সত্যের প্রেরণা রাখে এবং কল্যাণ প্রবাহের বৈশিষ্ট্য নিজের মাঝে ধারণ করে। এমন নামায অবশ্যই পাপ দূরীভূত করে। নামায কেবল ওঠা বসার নাম নয়। নামাযের সত্যিকার প্রাণ এবং সার হলো সেই দোয়া যা নিজের মাঝে এক প্রকার আনন্দ এবং স্বাদ অন্তর্নিহিত রাখে।

এরপর নামাযের বিভিন্ন অবস্থার উদ্দেশ্য ও প্রজ্ঞা আর আমাদের ওপর এর যে প্রভাব পড়া উচিত এর বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, **স্মরণ রেখো! নামাযে বাস্তব এবং বাহ্যিক উভয় অবস্থার সমাহার ঘটা আবশ্যক অর্থাৎ প্রধানতঃ বাহ্যিক বা দৈহিকভাবে নামাযের জন্য দন্ডায়মান হওয়া দ্বিতীয়তঃ এই সচেতনতাও থাকা আবশ্যক যে, মানুষ আল্লাহ্‌র সামনে দন্ডায়মান হয়ে আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলছে।** তিনি (আ.) বলেন, **অনেক সময় রূপকভাবে কোন সংবাদ দেয়া হয় অর্থাৎ রূপক অবস্থা সৃষ্টি হয়।** তিনি (আ.) বলেন, **কোন কোন সময় ছবির মাধ্যমে কোন কথা প্রকাশ করা হয়** অর্থাৎ এমন ছবি দেখানো হয় যার মাধ্যমে দর্শক বুঝতে পারে

যে, এটি এর উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে নামায হলো খোদা তা'লার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের প্রতিচ্ছবি। খোদা তা'লা মানুষের কাছে কী চান নামাযের বিভিন্ন অবস্থায় তার এক রূপক প্রতিফলন সেটি, এক রূপক দৃষ্টান্ত। নামাযে যেভাবে মৌখিকভাবে কিছু পড়া হয় অনুরূপভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উঠা-বসা বা গতিবিধির মাধ্যমে কিছু দেখানো হয়। নামাযে আমরা মৌখিকভাবে যা পড়ি, আমাদের যে অঙ্গ-ভঙ্গি তা-ও সেই শব্দের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। মানুষ যখন দাঁড়ায়, আর আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা এবং পবিত্রতার গান গায় এর নাম রেখেছেন 'ক্বিয়াম' অর্থাৎ দন্ডায়মান হওয়া। প্রত্যেক ব্যক্তি জানে, খোদার প্রশংসা এবং গুণকীর্তনের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় হলো, ক্বিয়াম বা দন্ডায়মান হওয়া। তিনি (আ.) বলেন, দেখ! বাদশাহ্দের সমীপে কাসিদা বা কবিতা দাঁড়িয়েই পড়া হয়। অতএব যেখানে বাহ্যিক ক্বিয়াম রাখা হয়েছে সেখানে মৌখিক প্রশংসা বা গুণকীর্তন রাখা হয়েছে। এর অর্থ হলো, আধ্যাত্মিকভাবেও তোমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দন্ডায়মান হও। যখন মানুষ দন্ডায়মান হয় আর সূরা ফাতিহা পড়ে এবং আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে তখন আধ্যাত্মিকভাবেও হৃদয়ে ক্বিয়াম বিরাজ করা উচিত। তিনি (আ.) বলেন, কোন কথার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই প্রশংসা করা হয়। যে ব্যক্তি সত্যায়নকারী হয়ে কারো প্রশংসা করে সে একটি মতামতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই তা করে। মিথ্যা প্রশংসা তো করা হয় না। মানুষ যদি সত্যবাদী হয়, কারো সত্যায়ন করেই সে তার প্রশংসা করে। তাই যে আলহামদুলিল্লাহ্ বলে, সত্যিকার অর্থে আলহামদুলিল্লাহ্ সে তখন বলতে সক্ষম যখন তার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে যে, সকল প্রকার প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লারই। এই কথা যদি পূর্ণ স্বতঃস্ফুর্ততার সাথে হৃদয়ে লালন করে তাহলে এটি আধ্যাত্মিক ক্বিয়াম। সব প্রশংসা খোদা তা'লার, তিনিই সব প্রশংসার যোগ্য, তাঁরই প্রশংসা করা উচিত আর তাঁকে বাদ দিয়ে এমন কেউ নেই যার প্রশংসা করা যেতে পারে ; এই যদি হৃদয়ের চিত্র হয় তাহলে এটি শুধু হাত বেধে দন্ডায়মান হওয়া নয় বরং এটি আধ্যাত্মিকভাবেও দন্ডায়মান হওয়া বা ক্বিয়াম কেননা হৃদয় এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ধরে নেয়া হয় যে, সে দন্ডায়মান হয়েছে। বাহ্যিক অবস্থা অনুসারে সে দন্ডায়মান হয়েছে যেন এই আধ্যাত্মিক ক্বিয়াম তার ভাগ্যে জোটে। আন্তরিক অবস্থা অনুসারে সে দৈহিকভাবে দন্ডায়মান হয়েছে।

এরপর রুকুতে 'সুবহানা রাব্বিআল আযীম' বলে। রীতি হলো, কারো মাহাত্ম্য যখন মানুষ স্বীকার করে তখন তার সামনে সে ঝুঁকে। মাহাত্ম্যের দাবি হলো, তার জন্য রুকু করা। মৌখিকভাবেও 'সুবহানা রাব্বি আল আযীম' ঘোষণা করেছে আর ব্যবহারিকভাবেও ঝুঁকেছে। মুখ আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ঘোষণা করে, তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে আর একই সাথে মানুষ রুকুতে যায় অর্থাৎ ঝুঁকে যায়। এটি সেই উক্তির সাথে বাস্তব অবস্থার সামঞ্জস্য। মুখে শব্দ উচ্চারিত হয়েছে আর দৈহিকভাবেও ঝুঁকেছে।

এরপর তৃতীয় উক্তি হলো, 'সুবহানা রাব্বিআল আ'লা। 'আ'লা' হলো আফআলুল তাফযীল (আরবী ব্যকরণে সবচেয়ে গভীর অর্থ প্রদানকারী ক্রিয়ার রূপ)। শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের পরম বাহ্যিক বহিঃপ্রকাশ হলো, সেজদা। খোদা তা'লার মাহাত্ম্যের সবচেয়ে মহান বহিঃপ্রকাশ হলো সিজদার অবস্থা অর্থাৎ সেই দৈহিক অঙ্গ-ভঙ্গি যাহলো সিজদা। খোদার মাহাত্ম্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর

পবিত্রতা এবং গরিমা বর্ণনার এই রীতি সিজদার দাবী রাখে অর্থাৎ আল্লাহ্র দরবারে সম্পূর্ণভাবে সিজদাবনত হওয়া। এর বাস্তব ও বাহ্যিক প্রতিচ্ছবি হলো সিজদাবনত হওয়া। **‘সুবহানা রাব্বি আল আলা’র সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ দৈহিক অবস্থাও তাৎক্ষণিকভাবে সে বরণ করল অর্থাৎ আল্লাহ্ তা’লা যে মহান তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের আন্তরিক স্বীকারোক্তির পাশাপাশি মাটিতে সিজদা করে। এই অবস্থা সে ধারণ করে, এটিই সেই অবস্থার বাস্তব বহিঃপ্রকাশ।**

অতএব এই হলো তিনটি মৌখিক স্বীকারোক্তির পাশাপাশি তিনটি দৈহিক অঙ্গ-ভঙ্গি। প্রথমে একটি চিত্র তাঁর সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। সকল প্রকার ক্বিয়াম করা হয়েছে, জিহ্বা যা দেহের অংশ সেও ঘোষণা করল এবং এতে সে যোগ দিল। তৃতীয় জিনিস ভিন্ন তা যদি অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহলে নামায হয় না – তা কী? তা হলো সেই হৃদয়। হৃদয়ের ক্বিয়ামও এর জন্য আবশ্যক। এর ওপর দৃষ্টিপাতে আল্লাহ্ যেন দেখতে পান, সত্যিকার অর্থে সে প্রশংসা করছে এবং দন্ডায়মান রয়েছে। আত্মাও দন্ডায়মান হয়ে প্রশংসা করে এবং সিজদা করে। কেবল দেহই নয় বরং আত্মাও দন্ডায়মান রয়েছে অর্থাৎ হৃদয়ের অবস্থা আল্লাহ্ তা’লা জানেন, আল্লাহ্ দেখছেন, দেহের পাশাপাশি তার আত্মাও আল্লাহ্র প্রশংসা করছে বা রুকু করছে বা সিজদাবনত। যখন ‘সুবাহানা রাব্বি আল আযীম’ বলে তখন শুধু মাহাত্মের এই স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট নয় বরং একই সাথে তাকে ঝুঁকতেও হবে আর একই সাথে আত্মারও ঝুঁকা আবশ্যক। তৃতীয় পর্যায়ে খোদার দরবারে সিজদাবনত হয়েছে, তাঁর পদমর্যাদার মাহাত্ম্য বা উচ্চতার ঘোষণার পাশাপাশি দেখা উচিত, আত্মাও আল্লাহ্ তা’লার একত্ববাদের আস্তানায় সিজদাবনত কি-না অর্থাৎ একইভাবে হৃদয়েরও সিজদা আবশ্যক। বস্তুতঃ যতক্ষণ এই অবস্থা সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ যেন সে আশ্বস্ত না হয়। কেননা; **“يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ”**-র অর্থ এটিই।

যদি প্রশ্ন করা হয়, এই অবস্থা কীভাবে সৃষ্টি হতে পারে, কীভাবে সৃষ্টি করা যেতে পারে? এর উত্তর হলো, রীতিমত নামায পড়া এবং কুমন্ত্রণা ও সন্দেহ সৃষ্টি হলে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত না হওয়া। নামাযের সময় কুমন্ত্রণা আর সন্দেহ সৃষ্টি হলে উদ্বিগ্ন না হয়ে রীতিমত নামায পড়তে থাকো। প্রাথমিক অবস্থায় সন্দেহ ও কুমন্ত্রণার সাথে অবশ্যই যুদ্ধ করতে হয়, শয়তান আক্রমণ করে, শয়তানের সাথে যুদ্ধ চলতে থাকে। এর চিকিৎসা হলো, অবিচলতার সাথে ক্লান্তি-শ্রান্তির উর্ধ্বে থেকে এবং ধৈর্যের সাথে নামাযে রত থাকা, আল্লাহ্র কাছে দোয়া করতে থাকা। অবশেষে সেই অবস্থা সৃষ্টি হয় যার কথা আমি এখনই বলেছি। অতএব অবিচলতা হলো শর্ত। এটি যদি মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয় তাহলে খোদা তাঁর বান্দার কাছে ছুটে আসেন, এরপর খোদার কৃপাবারীও বর্ষিত হয় । কিন্তু এই সত্য এবং বাস্তবতা অনেকে বুঝে না, তড়িঘড়ি করে খোদা তা’লার দ্বার পরিত্যাগ করে বা এর গুরুত্ব বুঝে না আর দুনিয়ার মানুষের দ্বারে ধরনা দেয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এরপর স্মরণ রাখার যোগ্য বিষয় হলো, **এই নামায যা সত্যিকার অর্থেই নামায তা দোয়ার মাধ্যমেই লাভ হতে পারে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কাছে হাত পাতা মু’মিন সুলভ আত্মাভিমানের স্পষ্ট এবং প্রকাশ্য বিরোধী। কেননা দোয়ার এ ধরণ বা রীতি কেবল খোদা তা’লারই প্রাপ্য। মানুষ সচরাচর দৈনন্দিন জীবনে একে অন্যের মুখাপেক্ষী**

হয়েই থাকে, একে অন্যের কাছে কিছু চেয়েই থাকে কিন্তু কারো কাছে এমনভাবে হাত পাতা যা শুধু খোদা তা'লার সামনে পাতা উচিত, আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য কারও কাছে আশা রাখা এবং অন্য কারও ওপর নির্ভর করা এটি ভুল। তিনি (আ.) বলেন, **মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তুচ্ছ জ্ঞান করে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে হাত না পাতবে, তাঁর কাছে না চাইবে, নিশ্চিত জেনো, প্রকৃত অর্থে সেই ব্যক্তি মুসলমান এবং সত্যিকার মু'মিন আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য নয়। ইসলামের প্রকৃত অর্থ এবং মর্ম হলো, তার সব শক্তি, তা আভ্যন্তরীণ হোক বা বাহ্যিক, পুরোটাই যেন খোদা তা'লার আস্তানায় সিজদাবনত থাকে। যেভাবে একটি বড় ইঞ্জিন অনেক কলকব্জাকে পরিচালিত করে এক ধরণের গতি সৃষ্টি করে অনুরূপভাবে মানুষ যতক্ষণ তার প্রতিটি কাজ, প্রত্যেক গতিবিধি এবং উঠা বসাকে সেই ইঞ্জিনের মহান শক্তির অধীনস্ত না করবে সে কীভাবে খোদার খোদকারীতে বিশ্বাসী বলে গণ্য হতে পারে? আর** إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ (সূরা আল্ আন'আম:৮০) **বলার সময় প্রকৃত অর্থেই হানিফ আখ্যায়িত হতে পারে কি? মৌখিক স্বীকারোক্তির পাশাপাশি তাৎক্ষণিকভাবে এদিকে যদি মনোযোগ নিবদ্ধ হয় তাহলে নিঃসন্দেহে সে মুসলমান, সে মু'মিন এবং সে হানিফ বা একত্ববাদী।** মৌখিক স্বীকারোক্তির পাশাপাশি যদি আল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয় তাহলে সে মুসলমানও আর মু'মিনও আর হানিফ বা একত্ববাদীও। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে হাত পাতে আর সেদিকেও আকৃষ্ট হয়, অর্থাৎ একদিকে আল্লাহ্‌র কাছে ঝুঁকে অপরদিকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের সামনেও ঝুঁকে, তার স্মরণ রাখা উচিত, সে অনেক বড় দুর্ভাগা এবং বঞ্চিত। তার জীবনে সেই সময় আসবে যখন সে মৌখিকভাবে বা বাহ্যিকভাবেও আল্লাহ্‌র সামনে আর ঝুঁকতে পারবে না অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তাকে ছেড়ে দিবেন। একটি সময় এমন আসবে যখন বাহ্যিক অর্থেও সে খোদা তা'লার সামনে সিজদাবনত হতে পারবে না। তিনি (আ.) বলেন, **নামায ছেড়ে দেয়ার আর আলস্যের একটি কারণ হলো, মানুষ যখন আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যের সামনে নত হয় তখন আত্মা এবং হৃদয়ের শক্তি সেই বৃক্ষের ন্যায় হয়ে যায় যার শাখা-প্রশাখাগুলোর প্রথমে একপাশে ফিরিয়ে দিলে সেই অবস্থায়ই তা বড় হয় আর তখন তা সেদিকেই ঝুঁকে থাকে। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তার হৃদয়ে এক প্রকার কঠোরতা সৃষ্টি হয়ে তাকে পাথর বানিয়ে দেয় আর তা জড় বস্তুতুল্য হয়ে যায়।** গাছের ডাল-পালা যদি একদিকে ঘুরিয়ে বেধে দেয়া হয় তাহলে গাছ সে দিকেই ঝুঁকে যায়। অনুরূপভাবে মানুষও যদি বান্দার প্রতি আকৃষ্ট হয় তাহলে বান্দারই হয়ে যায়। খোদার বিষয়ে তার হৃদয় কঠোর হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, **গাছের যেসব শাখা-প্রশাখা বা ডাল-পালা এক দিকে ঝুঁকে যায় সেগুলো আর অন্য দিকে ফিরতে পারে না অনুরূপভাবে হৃদয় এবং আত্মা খোদা তা'লা থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যায়। অতএব এটি খুবই ভয়াবহ এবং হৃদয়কে কাঁপিয়ে তোলার মত বিষয় যে, মানুষ আল্লাহ্ তা'লাকে পরিত্যাগ করে অন্যের কাছে হাত পাতবে। সে কারণেই যথাযথ প্রস্তুতির সাথে এবং রীতিমত নামায পড়া একান্ত আবশ্যক যেন প্রথম থেকেই তা এক স্থায়ী অভ্যাসের মত হৃদয়ে গ্রথিত হয় আর যেন আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকার বা প্রত্যাবর্তনের মনমানসিকতা সৃষ্টি হয় ;তাহলে ধীরে ধীরে এমন একটি সময় আসে যখন অন্যের**

সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে মানুষ এক জ্যোতির উত্তরাধিকারী হয় এবং আধ্যাত্মিক প্রশান্তি লাভ করে। প্রথম দিকে ঐকান্তিক চেষ্টা করে নামায পড়তে হয়, কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেলে, বিশুদ্ধ চিত্তে যদি আল্লাহ্‌র সামনে বিনত হতে থাকে তাহলে খোদার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হয়। তিনি (আ.) বলেন, **আমি বিষয়টি পুনরায় জোর দিয়ে বলব, পরিতাপ যে, আমি সেই শব্দ পাইনি যার মাধ্যমে অন্যের সামনে ঝুঁকার ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরা সম্ভব হতো। মানুষের কাছে গিয়ে আকুতি-মিনতি করে, তোষামোদ করে। একাজ খোদা তা'লার আত্মাভিমানে আঘাত হানে। এটি মানুষের খাতিরে নামায পড়ার নামান্তর। অতএব খোদা তা'লা এথেকে পৃথক হয়ে একে দূরে ঠেলে দেন।** আমি সাদামাটা ভাষায় এ বিষয়টি বর্ণনা করছি, যদিও বিষয়টি আক্ষরিকভাবে এমন নয় কিন্তু ভালোভাবে বুঝা যায়, এটি একটি জাগতিক দৃষ্টান্ত, বুঝানোর জন্য বর্ণনা করছি। যেভাবে একজন আত্মাভিমানী পুরুষের আত্মাভিমান কখনই এটি দেখা পছন্দ করবে না যে, তার স্ত্রী পর পুরুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে। কিছু মানুষ এমনও হয়ে থাকে যারা এমতাবস্থায় সেই দুঃশ্চরিত্রা মহিলাকে হত্যা করাও আবশ্যক মনে করে। তিনি (আ.) বলেন, **প্রকৃত দাসত্ব এবং দোয়া বিশেষ করে এই সত্তারই প্রাপ্য। আল্লাহ্ তা'লা চান না যে, অন্য কাউকে মা'বুদ বা উপাস্য আখ্যা দেয়া হবে বা কাউকে এভাবে ডাকা হবে। অতএব স্মরণ রেখ! খুব ভালোভাবে স্মরণ রেখ! যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের সামনে ঝুঁকা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার নামান্তর। নামায বা একত্ববাদ যাই বল না কেন, ব্যবহারিক অর্থে আল্লাহ্‌র সামনে ঝুঁকাই হলো, নামায। এটি তখন কল্যাণশূন্য এবং অর্থহীন হয় যখন তার সাথে আত্মবিলুপ্তি, আত্মপেষণ এবং একত্ববাদী হৃদয় অন্তর্ভুক্ত না হবে।**

কেউ কেউ বলে আমরা অনেক কেঁদেছি, অনেক নামায পড়েছি কিন্তু কোন লাভ হয়নি। এমন মানুষের কথা খণ্ডন করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **অনেকেই মনে করে, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আকুতি-মিনতি ও আহাজারি করলে কিছু লাভ হয় না, এ কথাটি সম্পূর্ণরূপে ভুল এবং মিথ্যা। এমন মানুষ আল্লাহ্ তা'লার সর্বময় ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ বৈশিষ্ট্যে বিশ্বাস রাখে না। যদি তাদের মাঝে সত্যিকার ঈমান থাকত তাহলে তারা এমনটি বলার ধৃষ্টতা দেখাত না। কোন ব্যক্তি যখনই আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আসে এবং সত্যিকার অর্থে তওবার সাথে প্রত্যাবর্তন করে আল্লাহ্ সব সময় তার প্রতি কৃপা করেন। এক কবি পরম সত্য বলেছেন,**

"আশেক কে শুদ কে ইয়ার বেহালেশ নাযার না কারদ্
এ্যা খাঁজা দারদ্ নিস্ত, ওগার না তবীব হাস্ত"

অর্থাৎ ,সে কিসের প্রেমিক হলো যার প্রতি প্রেমাষ্পদ চোখ তুলেই তাকায় না, হে মানুষ! কোন ব্যাথাই নেই ডাক্তার অবশ্যই উপস্থিত আছে, তাই তোমার ধারণা ভুল। আল্লাহ্ তা'লা চান তোমরা পবিত্র হৃদয় নিয়ে তাঁর কাছে আস। তাঁর অবস্থা অনুসারে নিজের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করাই হলো শর্ত। এটি অনেক বড় কথা, তাঁর অবস্থা অনুসারে নিজেদের মাঝে পরিবর্তন আন, যেভাবে তিনি বলেছেন সেভাবে জীবনযাপন কর। যা মানুষকে আল্লাহ্‌র দরবারে যাওয়ার যোগ্য করে নিজের মাঝে সেই পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করে দেখাও। **আমি প্রকৃত অর্থেই বলছি,**

খোদার মাঝে বিস্ময়কর সব ক্ষমতা রয়েছে। তাঁর মাঝে অনন্ত কৃপা এবং কল্যাণরাজি নিহিত আছে কিন্তু তা দেখার জন্য ভালোবাসার চোখ সৃষ্টি কর। আল্লাহ্‌কে সত্যিকার অর্থে ভালোবাস, যদি সত্যিকার ভালোবাসা থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অনেক বেশি দোয়া গ্রহণ করেন, আর সাহায্য এবং সমর্থন প্রকাশ করেন।

অতএব আমাদের নিজেদের মাঝে এমন পরিবর্তন আসা উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া শোনেন। যারা আপত্তি করে যে, খোদা তা'লা শোনেন না বা গ্রহণ করেন না তাদের অধিকাংশ এমন যারা পাঁচবেলার নামাযই ঠিকমত পড়ে না। নামাযের কথা তাদের কেবল তখন মনে পড়ে যখন জাগতিক কোন সমস্যায় জর্জরিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি অবশ্যই শুনবো কিন্তু আমার নির্দেশও তোমরা মেনে চল। সবার আত্ম-অবস্থান খতিয়ে দেখা উচিত যে, খোদার নির্দেশাবলী সে মেনে চলে কি না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন, **কুরআনে সাতশত আদেশ-নিষেধ আছে, এখন যদি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে তাহলে প্রথমে এ কথার উত্তর দিক, কয়জন এমন আছে যারা এই সাতশত নির্দেশ মেনে চলে?** যদি তুলনা করতে হয় তাহলে এখানেও তুলনা করা আবশ্যক। এটি খোদার পরম অনুগ্রহ যে, এসব সত্ত্বেও বান্দার প্রতি করুণা প্রদর্শন করে তাদের ভুল ভ্রান্তিকে তিনি উপেক্ষা করেন, তাদের দোয়াও গ্রহণ করেন। অনেকেই এমন আছে যারা হয়তো রীতিমত নামাযেও অভ্যস্ত নয় কিন্তু তাদের দোয়াও গৃহীত হয়েছে, এটি খোদার অনুকম্পা। বরং আল্লাহ্ তা'লা দোয়া না করা সত্ত্বেও তাঁর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলীর অধীনে মানুষের অভাব মোচন করেন। তাই অভিযোগের কোন সুযোগ নেই। কাজেই আমাদেরকে খোদার নির্দেশ অনুসারে চলার চেষ্টা করা উচিত। আর সে অনুসারে নিজেদের ইবাদত, নামায এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত পুরোপুরি একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হবে তার মাঝে ইসলামের ভালোবাসা এবং মাহাত্ম্য সৃষ্টি হতে পারে না।** তিনি (আ.) বলেন, **নামাযের স্বাদ এবং আনন্দ সে পেতে পারে না। সফলতার চাবিকাঠি হলো নামায, যতক্ষণ নোংরা ইচ্ছা, অভিপ্রায়, নোংরা পরিকল্পনা এবং ষড়যন্ত্র ভস্মিভূত না হবে, আমিত্ব এবং শত্রুতা দূরীভূত হয়ে আত্মবিলুপ্তি এবং বিনয় সৃষ্টি না হবে, ততক্ষণ আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দা আখ্যায়িত হতে পারে না।** তিনি (আ.) আরো বলেন, **পূর্ণ দাসত্ব শেখানোর জন্য সর্বোত্তম শিক্ষক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো নামায। যদি প্রকৃত অর্থে বান্দা হতে হয় এর জন্য সর্বোত্তম জিনিস, সর্বোত্তম উপায় এবং সর্বোত্তম শিক্ষক হলো, নামায।** তিনি (আ.) বলেন, **আমি আবার তোমাদের বলছি, যদি খোদার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক এবং সত্যিকার যোগসূত্র স্থাপন করতে চাও তাহলে নামাযের ওপর প্রতিষ্ঠিত হও। এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হও যে, শুধু তোমাদের দেহ এবং জিহ্বাই নয় বরং তোমাদের রূহের প্রতিটি আবেগ অনুভূতি যেন মূর্তিমান নামায হয়ে যায়।**

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন, আমরা যেন নিজেদের নামাযের সেভাবে সুরক্ষা এবং হিফাযত করতে পারি যেন আমাদের আত্মা এবং প্রতিটি আবেগ-অনুভূতি সত্যিকার অর্থে নামায আদায়কারী হয়ে যায়।

নামাযের পর একজনের গায়েবানা জানাযা পড়াব যা করাচীর সাবেক আমীর শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেব-এর স্ত্রী আসগরী বেগম সাহেবার জানাযা। গত ২৭শে মার্চ আমেরিকায় স্বল্পকাল অসুস্থ্য থেকে ৯০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । ১৯৪৩ সনে শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেবের সাথে তার বিয়ে হয়, স্বামীর পূর্বেই তিনি ১৯৪৪ সনে লাহোরে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর হাতে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। সারা জীবন খিলাফতের প্রতি, বয়আতের অঙ্গীকারকে পরম নিষ্ঠা এবং স্বচ্ছতার সাথে পালন করেছেন। সন্তান-সন্ততিকে সব সময় খিলাফতের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখার নসীহত করেন। খিলাফতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। যখন থেকে এমটিএ আরম্ভ হয়েছে, এমটিএ দেখা তার সবচেয়ে পছন্দনীয় কাজ ছিল। ওসীয়ত করেছিলেন, ধৈর্যশীলা, কৃতজ্ঞ, দোয়াগো এবং তাহাজ্জুদ গুযার ছিলেন, নামায, রোযায় গভীরভাবে অভ্যস্ত ছিলেন, রীতিমত কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তার স্বামী করাচীতে জামাতের যে দায়িত্ব পালনের সুযোগ লাভ করেছেন তখন তার পাশাপাশি তিনিও জামাতের সেবা অব্যাহত রেখেছেন। আতিথেয়তা তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। যখন শেখ সাহেব করাচীর আমীর ছিলেন তার ব্যস্ততা ছিল সীমাহীন। সে যুগে আতিথেয়তার দায়িত্ব অনেক বেশি পালন করতে হতো, এই দায়িত্ব তিনি খুব সুচারুরূপে পালন করেছেন। তিনি খলীফা সানী এবং খলীফা সালেসের এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে'র আতিথ্যের সম্মান লাভ করেছেন। আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রেও তিনি অনেক অগ্রগামী ছিলেন। ১৯৫০ সনে জামাতের ওপর আর্থিক অসচ্ছলতার একটি যুগ আসে তখন খলীফা সানী (রা.) আর্থিক কুরবানীর বিশেষ তাহরীক করেন। তখন শেখ সাহেব (অর্থাৎ তার স্বামী) আয়ের একটা বড় অংশ জামাতের জন্য দিতে থাকেন; তিনিও কুরবানীতে তার সমঅংশীদার ছিলেন। খুবই সহজ-সরল জীবন যাপনকারীনি, কৃত্তিমতমুক্ত নারী ছিলেন। তার ছেলে লিখেন, প্রায় সময় খলীফাতুল মসীহ্র কাছে দোয়ার পত্র লেখার নসীহত করতেন সন্তানদের। তিনি পাঁচজন পুত্র, দুইজন কন্যা এবং ৪৩জন পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। তার এক পুত্র ডা. নাসিম রহমতুল্লাহ্ সাহেব আমেরিকার নায়েব আমীর, আমাদের ওয়েব সাইট alislam.org-এর ইনচার্জও। অনুরূপভাবে তাদের জামাতা রহমানী সাহেব এখানে বসবাস করেন, তিনিও দীর্ঘকাল সেক্রেটারী ওসীয়্যত হিসেবে কাজ করেছেন। তার স্ত্রী জামিলা রহমানী নিজ হালকায় সেক্রেটারী মাল এবং অন্যান্য দায়িত্বও পালন করেছেন এবং করছেন। তার এক পুত্র ফরহাতুল্লাহ্ শেখ সাহেব ফয়সালাবাদের নায়েব আমীর। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তান-সন্ততি এবং বংশধরদের জামাত এবং খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।